উপসংহার

লোকছড়াগুলির বিষয় ও আবেদন থেকে একটি বিষয় পরিস্কার হয় যে, মানব জীবনের শুরু থেকে অন্ত অবধি সম্ভাব্য সকল জীবন পর্বের ও অভিজ্ঞতার স্পর্শে সিঞ্চিত হয়ে আছে এই ছড়াগুলি। অর্থাৎ ছড়ার মধ্যে যে টুকরো টুকরো ছবি আছে তার মধ্যে দিয়েই অতীতের রূপটি আমরা দেখতে পাই।

ছড়াগুলির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নৃ-বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতার কথা বলেন, তেমনিই পদ্ধতি হিসাবে অনুভবী পদ্ধতির অস্তিত্বও অস্বীকার করেন না। রোথেনবার্গ (১৯৮৫) যেমন আদিবাসীদের, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মৌলিক সাহিত্যের মধ্যে প্রত্ন কবিতার বীজ খুঁজে পেয়েছেন। অন্যদিকে সুকুমার সেনও আদি বাংলার ছড়ার অনুসন্ধানে বেদের মধ্যেই তাঁর বীজ খুঁজে পান। যদিও প্রাচীন সমাজে মৌখিক কবিতা ও ছড়ার মধ্যে পার্থক্য টানা কঠিন। তাই ছড়ার পেছনে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ যা একই সঙ্গে ধর্মীয়, সামাজিক ও যাদুধর্মের উপকরণ সমৃদ্ধ - তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এইভাবে নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোয় বিচার করতে গিয়ে ছড়ার মধ্যে প্রাক্-আর্য কৃষি সমাজের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। কোন কোন ছড়ায় পাওয়া গেছে ঝুম চাষের চিত্র। লাঙ্গল ব্যবহার করে কৃষিকাজের চেয়ে পুরোনো ঝুম পদ্ধতিতে চাষ। অন্যদিকে উন্নত কৃষি সমাজের চিত্রও রয়েছে ছড়াগুলিতে। এইভাবে আপাত নিরীহ ছড়াগুলি বহন করে সমাজের বিবর্তনের চিত্র।

ম্যালিনোস্কি প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক ক্রিয়াবাদীদের মতে এইসব ছড়াগুলি কোন অপ্রয়োজনীয় অঙ্গের মতো না থেকে মানসিক তৃপ্তিদানের পাশাপাশি সমাজমনটিকেও একতাবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে এসেছে। তাছাড়া শিশুমনের সামাজিকীকরণেও ছড়ার ভূমিকা অপরিহার্য। এ বিষয়ে সনৎ কুমার নস্কর বলেন - "স্মরণাতীত কাল থেকে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে ছড়া। এই জীবনের সে সুখ-দুঃখের সঙ্গী, উত্থান-পতনের সাক্ষী। তার যাবতীয় রসদ সংগৃহীত হয়েছে এই জীবনের অভ্যন্তরস্থ মৃদভূমি থেকে। একদা রাজ-দরবারে অনেক কাব্য-মহাকাব্য- নাটক-উপাখ্যানাদির জন্ম হলেও তুচ্ছ বস্তু ছড়ার ভূমিষ্ট হবার সংবাদ পাওয়া যায় নি। কারণ মধ্যে থাকে আল্‌গা ভাবের কথা, ঘর-গেরস্থালির পাঁচাপাঁচির জীবনযাপনের কথা, যার সঙ্গে স্পষ্ট বৈপরীত্য আছে গুরুগম্ভীর মেজাজের ও অভিজাত চরিত্রের দরবারী সংস্কৃতির। মনে রাখতে হবে, সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের উদ্ভটত্ব বয়স্ক ও পূর্ণমাত্রার শিক্ষিত মানুষের রস ও রুচিবোধের দিকে তাকিয়ে আমদানিকৃত, কিন্তু ছড়ার উদ্ভটত্ব শিশু ও গ্রাম্যমনের খোরাকের উপযোগী।" [১]

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে নৃবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনা বহু নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়। আসে লিঙ্গাভিত্তিক চিন্তাধারা, সংকেতবাহী চিন্তাপ্রবাহ। তৈরী হয় ব্যাখ্যানবাদী নৃ-বিজ্ঞানের ঐতিহ্য। এই সবকটি দৃষ্টিকোণের সাহায্যেই ছড়াকে বিশ্লেষণ করা যায়। সংকেতবাহী আলোচনায় ছড়ার দেহস্থ নানা সংকেত কিভাবে সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে অর্থময় হয়ে ওঠে তা বোঝার প্রয়াস করা হয়। তবে ছড়া যেহেতু এক ধরনের সাহিত্য, তাই সাহিত্যগুণমন্ডিত প্রতীক বা সংকেত এর অঙ্গে শোভা পাবে, এমনটি ভাবাই সঙ্গত। কিন্তু নৃতত্ত্বে এই বিচারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল সামাজিক সংকেতগুলির বা প্রতীকগুলির নির্মাণ ও সংযোগের দিকটি। [২]

এই প্রসঙ্গেই চলে আসে ছড়ার চিরন্তন আধুনিকতার দিকটি। লোকছড়াগুলির রচনাকাল মধ্যযুগ থেকে বর্তমানকালে বিস্তৃত। রচয়িতা এবং স্থান কাল ও অনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতেও রয়েছে বৈচিত্র্য এবং সমসাময়িকতার উপাদান। এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার কারণে লোকছড়াগুলিকে আমরা উত্তর-আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত বলেও চিহ্নিত করতে পারি।

আধুনিকতা প্রাথমিকভাবে সেইসব চিন্তাধারা যা রেনেসাঁস, সমাজতন্ত্র, উপনিবেশবাদ, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদি প্রত্যয় ও ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিকশিত সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে। ইতিহাস বলে যে দেশে যখন রেনেসাঁস সূচিত হয়েছে সেই দেশে তখন থেকে আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশ ভারত তথা বাঙলাও তার ব্যতিক্রম নয়। বাঙলাদেশের রেনেসাঁসের সময়কাল ঊনবিংশ শতাব্দী হলেও আমাদের আলোচ্য ছড়াগুলি তার অনেক আগে অর্থাৎ সপ্তদশ, অষ্টাদশ, এমনকি তার আগেও রচিত হতে পারে। সুতরাং আধুনিকতা বা উত্তর আধুনিকতার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এদেশীয়

সাধারণ মানুষের ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক। তবুও ছড়াগুলির বিশ্লেষণ এমনকি আঙ্গিকগত রূপায়ণে আধুনিকতা তো বটেই উত্তর আধুনিকতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

সাহিত্যে আধুনিকতা পরিমাপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা প্রথম বলেন কান্ট। তাঁর ধারণায় চিন্তা হচ্ছে জ্ঞানের দুটি ধারার সংশ্লেষ। ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা জ্ঞানের আদান-প্রদানের প্রতিফলনেই রচিত হয় সৃষ্টিকার্য। পরবর্তীতে বাখতিন সাহিত্যের বিশ্লেষণে যোগ করলেন লগ্নতার কথা। সাহিত্য বিচারে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর মতে সাহিত্যে পাঠকের ভূমিকা বা অবস্থানটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোন বস্তু বা ঘটনা এমন অনেক অর্থ বহন করে যা দেশভেদে, কালভেদে, এমনকি ব্যক্তিভেদেও পরিবর্তিত হয়ে যায়। আরও একটি বিষয় হল একই ঘটনা বা বস্তুর নানারকম অর্থের মধ্যে দর্শনের মধ্যে পরস্পর সাপেক্ষতা অথবা লগ্নতা অবশ্যই থাকে। ইউরি লটম্যানের ব্যাখ্যায় কবিতা হচ্ছে বিভিন্ন প্রথা এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন। একটি কবিতা অথবা ছড়া সুতরাং একবার পাঠ করলেই হয় না, বার বার পাঠ করতে হয়, তা হলেই বিষয়টির অবয়বটি ধীরে ধীরে বোধগম্য হয়ে ওঠে। কবিতাটি এইভাবে বাঙ্ময় হয়ে ওঠার অন্তর্নিহিত কারণই হল পারস্পরিক লগ্নতা। সবকিছু মিলিয়ে নিয়ে দেরিদা যা বলেন তা হল সাহিত্যের কাছ থেকে প্রাপ্তির হিসেব-নিকেশ। তাঁর মতে মানুষের চিন্তা ও চেতনাকে, ঘটনাগত সমস্যাকে একটি কেন্দ্রীয় আগ্রহের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

এই সমস্ত কিছু তথ্যের সঙ্গে মিশেল ফুকো যা যোগ করলেন তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিকতার সংজ্ঞার প্রসঙ্গে তিনি স্থানিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিতে চান। স্থানীক জ্ঞান বলতে তিনি বোঝান সেই নিম্নবর্গীয় জ্ঞান যা কোনকালে এবং বর্তমানেও নির্জিত অবস্থায় চাপা পড়ে আছে। গভীর এবং কালানুক্রমিক অনুসন্ধানের ফলেই যার উদ্‌ঘাটন সম্ভব। এই অনুসন্ধানের ফলেই বেড়িয়ে আসে সমাজগত, রাজনীতিগত অথবা ব্যক্তিগত কোন সংঘর্ষ, সমর্পণ অথবা উত্তরণের ছবি। মিশেল ফুকো একেই বলেন জিনিয়ালজি বা বংশানুচরিত জ্ঞান। বংশানুক্রমে বয়ে আসা এই জ্ঞান বা জ্ঞানের পরিবর্তমানতাই একটি ছড়ার অন্তর্নিহিত অর্থের শক্তির যথার্থ পরিমাপকে নির্ধারণ করতে পারে।

বাংলা লৌকিক ছড়াগুলির ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি যে উত্তর আধুনিকতার এইসব বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবকটিই সে বহন করছে। এইসব ছড়াগুলি কে বা কারা লিখেছেন এইসব কথা পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও এর প্রকৃত রচয়িতার নাম জানার কোন উপায় নেই। কারণ বাস্তবিকই এইসব ছড়াগুলি সমাজের যৌথ সম্পত্তি, কোন লেখক বা পাঠকের একার নয়। ঠিক এই কথাটিই আধুনিক অবয়ববাদীরা বলতে চান যে ছড়া জাতীয় রচনাগুলি লেখক বা পাঠক কারো উপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা যেকোন অবস্থার বিপাকে সঞ্চিত হতে হতে তা আপনিই নির্মিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তারপর তা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, কখনও পরিবর্তিত কখনও সংশোধিত হয়ে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়। বাংলার লোকায়ত ছড়াগুলোর ক্ষেত্রেও যে একথা সম্পূর্ণ সত্য তা ছড়াগুলির জনপ্রিয়তাতেই প্রমাণিত হয়।

"সৃষ্টিশীল কবি স্বভাবের মানুষের আদিমতম রচনা ছড়া। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ঠিক কোন ধাপে ছড়ার আবির্ভাব ঘটেছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা যায় ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা জন্মানোর পর মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের ছন্দোময় কৌশল আবিষ্কার করে তার চালে দুলিয়ে দেয় তার বিচিত্র দর্শন-শ্রবণাদিজাত অভিজ্ঞতাকে। সৃষ্টিকালীন এই পটভূমি ছড়ার গঠনশৈলীতে বিপুল প্রভাব ফেলেছে। তাই দেখা যায় অধিকাংশ ছড়ার অন্তর্গঠনে আছে অসংবদ্ধ ভাবনার যুক্তিহীন পাগলামি, আর বহির্গঠনে মেলে ছন্দিত সুরের নর্তনশীল আবেশ। ছড়ার কথক ও শ্রোতা উভয়েই মুগ্ধ এর চিন্তাবর্জিত ছ্যাবলামিতে, বিশিষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গিমার দুলুনিতে।[৩]

গ্রন্থপঞ্জী

১। নস্কর সনৎ কুমার, ছড়ায় অসংলগ্নতা ও উদ্ভটত্ব / বাংলার ছড়া ছড়ার বাংলা, সম্পা - সৌগত চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ - ১৪৮

২। বন্দ্যোপাধ্যায় সুমহান, ছড়ায় নৃতাত্ত্বিক উপাদান / বাংলার ছড়া ছড়ার বাংলা, সম্পা - সৌগত চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ - ১০৫

৩। নস্কর সনৎ কুমার, ছড়ায় অসংলগ্নতা ও উদ্ভটত্ব / বাংলার ছড়া ছড়ার বাংলা, সম্পা - সৌগত চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ - ১৪৮